ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 329- 334
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.214

শেখর দেবরায়ের *মনসাকথা* নাটক: নির্মাণ-বিনির্মাণ

ড. প্রশান্ত দাস, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গভ. ডিগ্রি কলেজ ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 09.10.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The deconstructionists have remarkably explored and restructured the multiple dimensions of textual interpretation. *Deconstruction* literally implies a special mode of construction or reconstruction. Hence, it may be asserted that a literary work does not possess any fixed or absolute meaning or significance. Depending on the reader and the context of reading, the same text may reveal diverse meanings at different times. Although a particular meaning may appear conclusive after a single reading, multiple readings can gradually unfold several other interpretations, each of which remains equally possible and valid. The present paper analyzes Shekhar Debroy's celebrated play *Monsakatha* from Northeast India in the light of *Deconstruction Theory*. The discussion examines how the playwright, drawing upon the narrative framework of the *Mansamangal*, incorporates various elements of modern life and contemporary sensibilities into the dramatic discourse. Furthermore, through the innovative reinterpretation of *Mansamangal* motifs and a modern analytical perspective, the play emerges as a unique reflection of contemporary social consciousness.

Keywords: Deconstruction, Shekhar Debroy, Monsakatha, Mansamangal, Modern Interpretation, Northeast Indian Drama, Contemporary Consciousness

(এক)

'Deconstruction' বা 'বিনির্মানবাদ'-এর প্রবক্তা জাক দেরিদার (১৯৩০-২০০৪) মতে কোনো বয়ান বা পাঠকৃতির চূড়ান্ত অর্থ বলে কিছু হয় না। তাঁর মতে এতকাল মানব সমাজ যেসব অর্থকেন্দ্র তৈরি করে স্থিতিলাভের চেতনা গড়েছে, সেটি মানুষকে 'কেন্দ্র' কেন্দ্রিক একটি নির্দিষ্ট ধারণায় আবদ্ধ রেখেছে মাত্র। তিনি এই কেন্দ্রকেই ভেঙে দিতে চেয়েছেন, যাকে ভাঙন বা Deconstruction বলা যেতে পারে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে সাহিত্য সমালোচনায় এই তত্ত্বের ব্যাপক সম্প্রসারের সাথে সাথে টেক্সটকে দেখা হতে থাকে বিবিধ অর্থের মধ্যে। দেরিদার বিনির্মাণ বা 'Deconstruction' অর্থের বহু সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়। এই পদ্ধতিতে একটি টেক্সটকে পূর্বের তুলনায় আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। রচনার যাবতীয় সম্ভাব্য ব্যঞ্জনা পাঠকের সামনে বহু পাঠের ফলে উঠে আসে। বিনির্মাণ তত্ত্বের মধ্যে এক ধরনের ব্যাখ্যা বা interpretation থেকে যায়। একটি টেক্সট-এর ব্যাখ্যা কখনোই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। কেননা রচনার ভাষা ও বয়ানে বহুমাত্রিকতা থাকে, থাকে বহুকৌণিক বুনট যার কোনোটিই চূড়ান্ত নয় বা স্থির নয়। জাক দেরিদা মার্কস-এর ক্লাসিক রচনা পাঠ করে জানিয়েছিলেন, এই ধরনের রচনা ব্যাখ্যা করে কখনো সম্পূর্ণ অর্থ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাঠ এই ধরনের রচনায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে আসে। তাই রচনার পাঠ নিয়তই পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক পাঠের পরেই একটি বিশেষ অর্থ বা ব্যঞ্জনাকে চূড়ান্ত মনে হলেও একাধিক পাঠে আরো অনেক অর্থ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে পারে, যেগুলিকে সমানভাবেই সম্ভাব্য মনে

হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। সেই অর্থগুলোর কোনোটাকেই অগ্রাহ্য করা যায় না। পাশাপাশি বহু অর্থময়তার উন্মোচনে মূল পাঠের স্রষ্টা বা Author-এর উদ্দিষ্ট অর্থ কী ছিল সে ভাবনা-চিন্তাটাও অনেক সময় গৌণ হয়ে পড়ে।

Deconstruction অর্থাৎ বিশেষরূপে নির্মাণ। তাই বলা যেতে পারে, সাহিত্যিক রচনার একক কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ বা ব্যঞ্জনা নেই। পাঠভেদে কিংবা পাঠকভেদে একই রচনা নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ উপস্থাপন করতে পারে। সেই সঙ্গে রচনাটির সমস্ত অর্থ কিংবা ব্যঞ্জনা সমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণীয় হবে। কোনো রচনা যখন বিনির্মিত হয়, তখন শোষক ও শোষিতের স্থান পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়। অনেক সময় পুনর্নির্মাণের ফলে অব্যক্ত ও আপাত গৌণ বিষয় তার প্রান্তিক অবস্থান থেকে চলে আসতে পারে মনোযোগের কেন্দ্রে। কুহেলিকা সরে যায় আর নতুন পরিচয়ের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে পাঠকৃতির তাৎপর্য। সাধারণ পাঠে ভাষ্যকারেরা পাঠকৃতির এরূপ সম্ভাবনার কথা লক্ষই করেন না। বিনির্মাণবাদীদের দ্বারা পাঠকৃতির এইসব প্রান্তিক পরিসর আশ্চর্যজনকভাবে আবিষ্কৃত ও পুনঃগঠিত হয়ে থাকে। বিনির্মাণ নিয়ে দেরিদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পাঠের রীতি ‘way of reading text’. দেরিদা প্রচলিত পাঠ পদ্ধতির বিপ্রতীপে এক ভিন্ন পাঠ পদ্ধতির সন্ধান দেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী বিনির্মাণ কোনো সাহিত্য সমালোচনা প্রণালী বা পাঠরীতি নয়। দেরিদা বিনির্মাণের মাধ্যমে text-কে অধিভৌতিক শাসন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন।

দেরিদা নিজে টেক্সটকে কীভাবে পড়েন তার একটা সূত্রের কথা বলেছেন, সেটি হচ্ছে দুইবার করে পাঠ করা। রচনার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করা। পাঠক নিজেই রচনাটি বারবার পড়ে অনেক সময় নানান অর্থ করে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঠ করলে অর্থও ভিন্ন রকম হয়ে যায়। কোনো পাঠই তাই অনিবার্য নয়। একটি পাঠের দ্বারা অন্য পাঠটি প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। পাঠ বিশ্লেষণ বা সমালোচনার কাজটি তাই সৃজনশীল। একই রচনা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাঠ করেন, বিশ্লেষণ করেন। এই পদ্ধতিতে টেক্সট যেমন সৃজনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সমালোচনাও সৃজনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে নির্মাণ-বিনির্মাণের আলোকে শেখর দেবরায়ের জনপ্রিয় ‘মনসাকথা’ নাটকের একটি সৃজনশীল সমালোচনার প্রয়াস করা হলো।

(দুই)

দুই বঙ্গের জনপ্রিয় কাব্যধারা ‘মনসামঙ্গল’-এর কাহিনি বহুল প্রচারিত ও পরিচিত। খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অসংখ্য মনসামঙ্গল রচিত হয়েছে। কাব্যগুলো নিঃসন্দেহে ধর্ম বিষয়ক আখ্যান। দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এগুলো রচিত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের কাহিনি অবলম্বনে আধুনিককালে একাধিক উপন্যাস ও নাটক রচিত হয়েছে। যেমন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নাগিনীকন্যার কাহিনী’ (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), ‘অরণ্যবহ্নি’ (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ‘উত্তরঙ্গ’ (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ), অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘চাঁদবেনে’ (১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ), সেলিনা হোসেনের ‘চাঁদবেনে’ ইত্যাদি। তাছাড়া জনপ্রিয় কিছু উপন্যাসের মূল কাহিনির খণ্ডচিত্রে মনসামঙ্গলের কাহিনি যুক্ত হয়েছে। যেমন, অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ উপন্যাস দুটির কাহিনিতে মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ এসেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বের কাহিনি নিয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য দুটি নাটক হলো অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সওদাগরের নৌকা’ এবং শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বনিকের পালা’। তবে প্রতিটি নাটকের আবেদন ভিন্ন। মনসামঙ্গলের কাহিনি ও চরিত্রকে আর্কেটাইপ হিসেবে গ্রহণ করে এই নাট্যকারেরা আধুনিক যুগ-জীবন-জিজ্ঞাসাকে নিজেদের মত করে উপস্থাপন করেছেন। নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকে তাঁর ব্যক্তি জীবনের টানাপোড়েনকে চাঁদ সওদাগরের রূপকে ধরতে চেয়েছেন। অন্যদিকে নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকে আধুনিক যুগের মানব মনের দ্বন্দ্ব-চেতনাকে রূপায়িত করেছেন। এখানে ‘শিব জ্ঞানেশ্বর’ আর মনসা ‘সর্পিল অন্ধকারের প্রতীক’। জ্ঞানের সাধনায় চাঁদ দিগ্বিজয়ে পাড়ি জমালেও অজ্ঞানের অন্ধকার তাকে পরাভূত করে রাখে। যেমন করে আধুনিক যুগের মানুষ প্রেতের মত চিরকাল অন্ধকারের মধ্যেই জ্ঞানের সন্ধানে পাড়ি দেয়।

আমাদের আলোচ্য শেখর দেবরায়ের ‘মনসাকথা’ নাটকটি নাট্যকার নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা করেছেন। মনসামঙ্গলের উপাদানের নবপ্রয়োগে নাটকটি অনন্য হয়ে উঠেছে। নাট্যকার প্রচলিত কাহিনিকে আশ্রয় করে সমকালীন সময়ের বাস্তব প্রতিফলন করতে চেয়েছেন। এই নাটকের বয়ান পাঠকের মনে একাধিক অর্থ বা ব্যঞ্জনার

জন্ম দেয়, মানব জীবনসংশ্লিষ্ট একাধিক বিষয়ের নতুন ব্যাখ্যা তুলে ধরে। এই নাটকের চরিত্র মধ্যযুগীয় হলেও তারা কেবল মধ্যযুগীয় হয়ে থাকেনি, প্রত্যেকটি চরিত্রই যেন বিশ শতকীয়, একুশ শতকীয় আধুনিক মানুষ হয়ে উঠেছে। মনসামঙ্গলের চিরাচরিত কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'মনসাকথা' নাটকটি নিছক মঙ্গলকাব্যের কাহিনিমাত্র হয়ে থাকেনি। আধুনিক যুগ-জীবনের উপযোগী করে নাট্যকার মধ্যযুগের কাব্য-কাহিনিকে নাট্য-কাহিনিতে পুনর্নির্মাণ করেছেন। নাটকটির বয়ান বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১) শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব।

২) প্রান্তিক মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই।

৩) ধর্ম, সংস্কার-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সংকট।

৪) নারীর অধিকার আদায়ের লড়াই।

আর্থিক বৈষম্যজনিত বঞ্চনা ও সমৃদ্ধির দুটি শ্রেণির দ্বন্দ্বচিত্র মনসাকথার একটি জোরালো বক্তব্য হয়ে উঠেছে। যাদের অর্থবল বেশি তাদের ক্ষমতাও বেশি। নাটকে ধনী ও দরিদ্র বৈষম্য, উচ্চবিত্তের শাসন-শোষণ ও নিম্নবর্গীয়ের বঞ্চনার কথা উচ্চারিত হয়েছে। চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে চাঁদের বা হাতে মনসার পূজা আদায়ের বিষয়টি নাটকের একমাত্র আলোচ্য নয়। এই নাটকের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে প্রান্তিক মানুষের অধিকার আদায় তথা আর্থ-সামাজিক সমস্যার জটিল জিজ্ঞাসা এবং নারীর লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত।

শাসক ও শাসিতের চিরকালীন সম্পর্ককে এই নাটকে রূপায়িত হতে দেখা যায়। চাঁদ সদাগর সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারী জমিদারের প্রতিভূ, আধুনিক পুঁজিপতি। প্রজা শোষণ করে ধনতন্ত্র কীভাবে তার জায়গা দখল করে নেয় সে চিত্রও নাটকে লক্ষণীয়। যারা চিরকাল সভ্যতার রথের চাঁকা এগিয়ে নিয়ে যায় তারা নিজেরা পড়ে থাকে অন্ধকারের অতলে। মানব সভ্যতার এই চিরন্তন সত্যটি এই নাট্য-কাহিনিতে নির্মিত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণির মানুষ আজীবন পরিশ্রম করে, অথচ তাদের দারিদ্র্য ঘুচে না। তারা গবীরই থেকে যায়। অন্যদিকে সমাজের ধনী শ্রেণির মানুষ (নাটকে চাঁদ) অর্থের পাহাড় জমাতে থেকে। তাদের জীবনে শুধু জোয়ার আর খেঁটে খাওয়া মানুষের জীবনে শুধু ভাঁটার টান। যুগে যুগে এভাবেই সাধারণ মানুষ নির্যাতিত ও শোষিত হতে হতে মাথা তুলে দাঁড়ায় ও নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। মাঝিমাল্লাদের কথা ও আচরণে বৈষম্যের দিকটি স্পষ্ট হয়—

> "নিজেগোর জানটা কার জন্য শেষ করছি। মোদের শরীরের ঘাম যত ঝরে— বণিক্যের দালান তত বাড়ে। হিসাব নিকাশের খাতাটা যখন খুলি— তখন দেখি, সদাগরেরা পূণ্নিমের চান্দের মত উজালা অইতেছে— আর আমরা যেন সব্বাই ঢাকা পড়্যে আছি অমাবস্যির আন্ধাইরে—। মা গো! জোয়ার ভাঁটা জগতের নিয়ম! মোদের জীবনে জোয়ার কই? কেবল দেখি ভাঁটার টান।"[১]

বর্তমান পুঁজিবাদের স্বরূপও নাটকে স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। মালিকের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে শ্রমিকের পরিশ্রম, অথচ তারা মালিক কর্তৃক শোষিত হয়। বৈষম্যের বিরুদ্ধে মাঝিমাল্লাদের প্রতিবাদ যেন চিরকালীন শোষিত বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদ। নাটকে সমবেত শক্তির প্রাচুর্যের প্রসঙ্গটিও লক্ষ করার মত। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক মানুষেরাও নিজেদের অধিকারের কথা সরবে উচ্চারণ করতে শেখে। তাই ধন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে মাঝিমাল্লাদের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়—

> "আইজ থাইক্যা পণ করি-আমরা আর মধুকরের কাঁড়ার ধরুম না ! সদাগরের ডিঙার বৈঠা হাতে নিমু না!"[২]

মনসাকথা নাটকে আধুনিক যুগ জীবনের প্রেক্ষিতে চাঁদ চরিত্রটি নাট্যকারের নবনির্মাণ। সে স্বৈরতান্ত্রিক পুঁজিপতি, মালিকপক্ষ, একনায়ক। সে যখন কথা বলে তখন পাঁচজনকে তা মেনে নিতে হয়, এমনই তার আধিপত্য। সমাজে নিজের আধিপত্য কায়েম রাখতে চাঁদ কোনো পরিবর্তনের হাওয়া নগরে আসতে দেয় না। যুগ যুগ ধরে চলে আসা অন্যায় অত্যাচারের শাসনকে সে বহাল রাখতে চায়। চম্পকে তার কথাই শেষ কথা। সে মনসাকে বলে—

> "আরে যা যা! - চেঙ্গমুড়িকানী। যুগ যুগ ধরি আমার বাপ ঠাকুর্দা ছিল সর্বগুণে বলী— সেই তেজবীর্য আমি বহন কইর‍্যে চলেছি। আগেও মোদের ক্ষ্যামতা ছিল, যা করবার চাইছি,- করেছি। আইজও চান্দ সদাগর যে কথ্য কয়, চম্পকের মনিষ্যির কাছে সেটাই শেষ কথা।"[৩]

চাঁদের কাছে ন্যায়-অন্যায় বিচার করার সময় নেই। চৌদ্দ পুরুষের চলা পথে সেও হেঁটে চলেছে। মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে তার শ্রমিক মালিক সম্পর্ক। ধন উপার্জনে মাঝিমাল্লাদের প্রয়োজন, তার অতিরিক্ত কোনো বিষয় সে গ্রাহ্য করে চলে না। সে জানায়—

> "এত নায্যি অনায্যি দেখলি আমার চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর পুণ্ন অইব না। আমার ডিঙার মাঝি যে অইব -তারে আমার মতেই চলতে অইব।"[৪]

ধর্মনৈতিক মৌলবাদের বিষয়টিও নাটকের অন্যতম জোরালো দিক। 'রাজার ধর্মই রাষ্ট্রের ধর্ম' প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচলিত এই প্রথাটি বর্তমানেও বহাল আছে। চাঁদ সদাগর অর্থ ও ক্ষমতা বলে নিজের ধর্মবিশ্বাস সাধারণের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। সে জানিয়ে দেয়—

> "আমার ক্ষ্যামতার সীমানায় বাবা ভোলানাথ ছাড়া আর কারো পূজা আচ্চা করা নিষেধ।"[৫]

সে কোনোভাবেই চম্পকে জনসাধারণের সংস্কৃতি ও ধর্মভাবনাকে স্বীকৃতি দেয় না। চম্পকের মানুষ নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, দেবদেবী, আচার-আচরণ নিয়ে চম্পকে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু চাঁদের আধিপত্যে তারা শেকড়হীন মানুষের মত বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতার বিষ যেভাবে চারদিকে আধিপত্য বিস্তার করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেও এই নাটকটি তাৎপর্যপূর্ণ।

মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে দেশজাতি সংস্কৃতির বিনাশকারী শক্তিকেও যে পরাভূত করা সম্ভব, সে চিত্রও নাটকে স্পষ্ট। চম্পকের মানুষ একসময় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ নেয়। তাদের এই লড়াইয়ে মনসা তাদের নেত্রী। শোষিত, বঞ্চিত মানুষের মানসকন্যা মনসা। তাদের দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনার আশ্রয়স্থল। তারা দেবী মনসাকে জানায়—

> "যতদিন বাম হাতের মাইন্যতা ডাইন হাতে আনতে না পারছি ততদিন আমরাও ক্ষান্তি দিমু না! কোনদিন না !"[৬]

মনসাকথা নাটকে অপর যে সংকটের প্রসঙ্গটি চোখে পড়ে তা হলো একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের ভাষা, সমাজ-সংস্কৃতির সংকট অর্থাৎ বলা যায় অস্তিত্বের সংকট। মানুষের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার ও সংস্কৃতির বিপর্যয়কে নাট্যকার চিহ্নিত করেছেন এখানে। নাটকে গায়েনের প্রশ্ন থেকে সেই সংকটের স্বরূপ আঁচ করা যায়।

> "আমার সমাজ ধর্ম আচার আচরণ আমার বুলি বাইক্য আমার গান বাদ্যি লইয়া আমি বাঁচুম—এইটায় যদি কেউ বাধা দিবার চায় তে অইলে তো মহাবিপদ।...জন্মের পর থাইক্যা যে বিরিক্ষির লগে আমাগোর চেনাজানা হয়, কেউ যদি তার শিকড় উপড়াইতে চায়—তে অইলে কি সেটা মাইন্যা লওন যায়? নাকি মাইন্যা লওন উচিত ?"[৭]

একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রাণসত্তা নিহিত থাকে তার ভাষা, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে। মানুষ আজন্ম নিজের ভাষা সংস্কৃতিকে অন্তরে লালন করে বেঁচে থাকে। অথচ চাঁদের রাজত্বে, তার আধিপত্যে কারো অধিকার ছিল না নিজের বুলি বাক্য, সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপন করার। চাঁদের ধনদৌলত, বাণিজ্যের ও ঐশ্বর্যের মূল কাণ্ডারি যারা সেই মাঝিমাল্লাদের ভাষা, বুলি, সংস্কার-বিশ্বাস ও ধর্মকে সে অপদস্ত করেছে। অন্যদিকে নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে সাধারণ মানুষ। চাঁদের অত্যাচারে চম্পকনগরে মনসা পূজা তথা নাগ পূজার অধিকার নেই। তাতে নাগ বংশ তথা মাঝিমাল্লাদের নিজের সংস্কার-বিশ্বাসের জগতে আঘাত লাগে। মনসাসহ নাগ সমাজের প্রতিটি মানুষ নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও পূজা-পার্বণ নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। বর্তমান বিশ্বে আধিপত্যবাদী শক্তির চাপে যেভাবে দেশীয় ছোট ছোট জাতি বা সম্প্রদায়ের ভাষা সংস্কৃতি বিপন্ন, চাঁদের আধিপত্যে দরিদ্র্য মাঝিমাল্লাদের সংকটের চিত্রটি যেন সেই সমস্যার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ নাটকে প্রতিফলিত চাঁদ ও মনসার লড়াই শুধুমাত্র মনসার পূজা আদায়েরই লড়াই নয়। এ যেন নারী পুরুষের সমতার লড়াই, অধিকারের লড়াই। চাঁদ সদাগর পুরুষ, প্রথম লিঙ্গের মানুষ। লিঙ্গের বিচারে সমাজে নারীর স্থান দ্বিতীয়। সামাজিক বিচারে নারীও তো নিম্নবর্গীয়, তাই তাদের আবেগ আকাঙ্ক্ষাগুলো পুরুষের পদতলে পিষ্ট হয়। পুত্রহারা সনকার করুণ আকুতিতে চাঁদের মন গলেনি। নারী হওয়ার কারণে চাঁদ মনসাকে কোনো ভাবেই সম্মতি দেবে না। এই নাটকে শাসক-শাসিতের লড়াই, শ্রমিক-মালিকের লড়াই, সমাজপতি ও প্রজার লড়াইয়ের পাশাপাশি নারী

পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নটিও বারবার উঠে এসেছে। পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ চাঁদ কোনো ভাবেই হীনজাতির স্ত্রী দেবী মনসাকে পূজা করতে রাজি নয়। সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়—

> "আর শোন ! পুরুষ অইয়ে লঘু জাতি নারীরে পূজা দিমু। জান থাকতি তা হবে না।"[৮]

বেহুলা ও মনসার কথোপকথনেও এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, নারী বলেই মনসাকে চাঁদ হেয় চোখে দেখে। বেহুলা বলে—

> "আমি বুঝি গো মা— এখন সব বুঝতে পারতেছি চম্পকনগরীর সমাজপতি একজন পুরুষ। তোমারে নারী বলে অমান্য করে।"[৯]

নারীর অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের প্রসঙ্গটিও নাটকের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে নিজের অধিকার আদায় করেই মনসা ক্ষান্ত নয় বরং পুরুষ হওয়ার অন্য চাঁদের যে দম্ভ ও অহংকার, মনসা তার বিনাশ করতে লড়াইয়ে নেমেছে। মনসা জানিয়েছে—

> "আমি যেমন নাগবংশের মাইন্যতা আদায় করতে চাই— তেমনি চাই চান্দের পুরুষ বইল্যা দম্ভের বিনাশ।"[১০]

মনসা ও বেহুলা দুজনেই নারী, উভয়েই পুরুষ শাসিত সমাজে নিজেদের অধিকার আদায় করতে চেয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বামীর ধর্ম স্ত্রীর ধর্ম হলেও মনসার পূজা করে সনকা স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। বস্তুত নাটকটি নারীর অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের জীবন্ত চিত্র হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় যে, জাঁক দেরিদার Deconstruction থিওরিও লিঙ্গ-নির্ভর চিন্তা ও সংস্কারের ভেদ রেখাকে মুছে ফেলে নারী-পুরুষ সমতার কথা, সমনির্ভরশীলতার কথা বলে। যার ভিত্তি লিঙ্গভেদ নয়, নারী-পুরুষের বিপরীত অবস্থান নয়।

সামন্ততান্ত্রিক শক্তির কাছে আপাত পরাস্ত হলেও চাঁদের বা হাতের পূজা আদায়ে সক্ষম হয় মনসা ও তার অনুগামীরা। শোষিত নির্যাতিতের প্রতিনিধি হিসেবে মনসা সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তুলেছে। একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের মতো মনসা ভবিষ্যতে ডান হাতের পূজা আদায়ের লক্ষ্যে লড়াই জারি রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। কেননা সমবেত শক্তির প্রচেষ্টা কখনো শেষ না, প্রবাহিত হয় যুগ যুগান্তরে। সাধারণ মানুষের কণ্ঠে শোনা যায় সংগ্রাম চালিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি—

> "মাগো আরম্ভ করেছ তুমি, কিন্তু শেষ করব আমরা।"[১১]

এ যেন মানুষের নিরন্তর জীবন সংগ্রামের ধারা।

(তিন)

মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে 'মনসাকথা' নাটকটি নাট্যকারের নবনির্মাণ, অতীতের মানুষের মধ্যে আধুনিক মানুষের সমস্যা আরোপ করে নাট্যকার নতুন কথা বলবার চেষ্টা করেছেন। শৈল্পিক কুশলতায় আধুনিক জীবনের জটিল স্বরূপ মনসাকথা নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। আধুনিক চিন্তন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নাটকটি হয়ে উঠেছে সমকালীন সময়ের প্রতিচ্ছবি। কাহিনি, চরিত্র মধ্যযুগীয় হলেও বিশ্লেষণে দেখা যায় নাটকটির আবেদন নিছক মধ্যযুগীয় হয়ে থাকেনি। নাটকের বয়ানে আধুনিক যুগ-জীবনের নানা অনুষঙ্গ এসে যুক্ত হয়েছে। রাজনৈতিক কূটকচাল, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারীর অধিকার আদায়ের লড়াই ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। যেহেতু বিনির্মাণ তত্ত্ব একটি টেক্সট বা পাঠকৃতিকে নানাভাবে বিশ্লেষণের সুযোগ দেয় তাই উক্ত প্রসঙ্গগুলোর বাইরেও একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে টেক্সটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কেননা টেক্সট বা পাঠকৃতি হলো একটি সজীব সত্তা, তাই টেক্সট-এর ব্যাখাও হবে নিয়ত পরিবর্তনশীল।

তথ্যসূত্র:

১) দেবরায়, শেখর। মনসাকথা। শিলচর কালচারাল ইউনিট, আসাম, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ- ১২।
২) তদেব, পৃ- ১১।
৩) তদেব, পৃ-২২।
৪) তদেব, পৃ-২২।
৫) তদেব, পৃ-৭।

৬) তদেব, পৃ-৪৫।
৭) তদেব, পৃ-১৫।
৮) তদেব, পৃ-২২।
৯) তদেব, পৃ-৩৭।
১০) তদেব, পৃ-৩৫।
১১) তদেব, পৃ-৪৫।

সহায়ক গ্রন্থ/প্রবন্ধ:

১) ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পাদিত)। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর। বাকপ্রতিমা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১২।

২) ঘোষ, প্রসূন। মঙ্গলকাব্য ও আধুনিক উপন্যাস (প্রবন্ধ) । বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৪১৩।

৩) দেবরায়, শেখর। মনসাকথা। শিলচর কালচারাল ইউনিট, আসাম, প্রথম প্রকাশ ২০০২।

৪) চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদক) । বুদ্ধিজীবীর নোটবই। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১।

৫) চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫।

৬) মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩।

৭) মুখোপাধ্যায়, বিমল। সাহিত্য বিবেক। গ্রন্থমেলা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬।

৮) সেন, নবেন্দু (সম্পাদক) । পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা। রত্নাবলী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২।

Web:

srijonbd.com/2017/06/29/সমালোচনা, accessed date 02/09/2018